তারিখ ... 15 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

প্রথম আলো

বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন ও বর্তমান হালচাল

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল শিক্ষাকে সর্বজনীন অধিকার। এর ৫৩ বছর পর সেই লক্ষ্য কতটা অর্জিত হলো, শিক্ষাব্যবস্থায় কী কী দুর্বলতা ও অসংগতি রয়ে গেছে, তার ওপর আলোকপাতই এবারের শিক্ষা দিবসে *প্রথম আলোর* আয়োজন। ১৭ সেপ্টেম্বরকে সামনে রেখে ধারাবাহিক আয়োজনের প্রথম লেখাটি প্রকাশিত হলো আজ।

শিক্ষার হালচাল

আবুল মোমেন

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের মূলে যে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, সেই কমিশন গঠিত হয়েছিল আইয়ুবের সামরিক শাসন জারির পরপর, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৮। কমিশনের প্রধান ছিলেন তৎকালীন শিক্ষাসচিব ড. এস এম শরিফ এবং সে কারণে রিপোর্টটি শরিফ কমিশন রিপোর্ট নামেই পরিচিতি পেয়েছে। কমিশন রিপোর্ট দাখিল করেছিল আট মাসের মাথায় ২৬ আগস্ট ১৯৫৯। এর কয়েকটি সুপারিশকে শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি এবং উচ্চশিক্ষা সংকোচনের জন্য উদ্দেশ্যমূলক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যেমন : ডিগ্রি কোর্স দুই বছর থেকে তিন বছর করা, কলেজ পর্যায়ে বছর শেষে পরীক্ষা ও তার ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী বর্ষে উন্নীত হওয়ার শর্ত, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পরীক্ষার ফলাফলের শর্ত। এগুলোকে ছাত্ররা সাধারণ পরিবারের সন্তানদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ বন্ধ করার ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে। তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার সুপারিশ নিয়ে। ক্ষমতায় এসেই আইয়ুব খান (অক্টোবর ১৯৫৮) সামরিক শাসন জারি করেছিলেন, এ সময় সব ধরনের রাজনীতি ছিল নিষিদ্ধ। ছাত্ররাজনীতি স্থায়ীভাবে নিষেধ করার মধ্যে সবাই আইয়ুবের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার মতলব আঁচ করেছিলেন।

কৌতূহলী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে ১০ সদস্যের কমিশনের চার বাঙালি সদস্য নাম : ড. মোমতাজউদ্দিন আহমেদ (উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), আবদুল হক (সদস্য, ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড), অধ্যাপক আতোয়ার হোসেন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ড. এম এ রশীদ (অধ্যক্ষ, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ)। উল্লেখ্য, কমিশনের চেয়ারম্যান ড. শরিফ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইয়ুবের শিক্ষক ছিলেন।

১৯৬০ সালের প্রথম দিকে শরিফ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তবে সামরিক আইন জারি থাকায় তখন আন্দোলন তেমন জোরদার হতে পারেনি। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহার হওয়ায় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ১৪৪ ধারার মধ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। এ উপলক্ষে প্রকাশিত ছাত্রনেতাদের বিবৃতি থেকে দাবিদাওয়া সম্পর্কে আঁচ করা যাবে। তাঁরা লিখেছেন, 'স্বৈরতান্ত্রিক আইয়ুবশাহী...ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করিয়া, তিন বৎসরের ডিগ্রি কোর্স চালু করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, কৃষি ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আসন সংখ্যা কমাইয়া দিয়া, স্কুল কলেজে বইয়ের বোঝা বৃদ্ধি করিয়া, তোগলকী সিলেবাস চালু করিয়া বৎসর বৎসর অর্থ ব্যয়কারী ফাইনাল পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করিয়া আসলে এমন এক শিক্ষা সংকোচন নীতি গ্রহণ করিয়াছে যাহাতে অধিকাংশ জনসাধারণের পুত্রকন্যাগণের শিক্ষা গ্রহণের পথই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।'

এদিন ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে, বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রাদেশিক মন্ত্রী খাজা হাসান আসকারির গাড়ি ও পুলিশের দুটি জিপে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশের বাধার মুখেও ছাত্রদের মিছিল এগিয়ে গেলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে মোস্তফা ও বাবুল নামে দুজন ঘটনাস্থলে নিহত হয় এবং পরদিন গুলিবিদ্ধ ওয়াজিউল্লাহ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে। ছাত্র আন্দোলনের মুখে সরকার শেষ পর্যন্ত শরিফ কমিশন রিপোর্টের বাস্তবায়ন স্থগিত ঘোষণা করে।

বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এ শিক্ষা আন্দোলন নিঃসন্দেহে ইতিহাসের বাঁক ফেরানো ঘটনা। ছাত্রনেতাদের বিবৃতিতে খাজনা বৃদ্ধি বা অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ ছিল। বস্তুত এ আন্দোলনের পর থেকে ছাত্রসমাজ কখনো চুপচাপ থাকেনি। তারা বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন করেছে এবং সরকারবিরোধী চেতনাকে বেগবান করেছে।

বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের পরে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় গেছে। এর ১০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। অনেক রাজনৈতিক উত্থান-পতন, সামাজিক ভাঙাগড়া, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও উত্তরণের ভেতর দিয়েও দেশ ও জাতি গিয়েছে। সময়ের এ দীর্ঘ ব্যবধানে জাতীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুণগত কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে। এসব পরিবর্তনের পেছনে কার্যকর প্রধান কয়েকটি উপাদান হলো—সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন ও আদর্শের পতন, মুক্তবাজার অর্থনীতির একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে তথ্যপ্রবাহ ও সব রকম যোগাযোগের পরিধি সীমাহীন ও প্রবল গতিশীল হয়ে ওঠা এবং এই দুই কারণে সৃষ্ট বিশ্বায়ন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ফলে শিক্ষায় সবার অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি এসেছে, কিন্তু মুক্ত প্রতিযোগিতায় বাজারই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় এসে যাওয়ায় শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ঠেকানো যায়নি। বেসরকারি খাতের পাশাপাশি শিক্ষায় ভ্যাট-ট্যাক্স বসিয়ে সরকারও এ কাজে তৎপর হয়ে উঠেছে। এ যাত্রায় ছাত্রদের প্রতিবাদের মুখে সরকার পিছু হটেছে, কিন্তু এ প্রবণতা বন্ধ হবে না বলেই মনে হয়।

সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম করাসহ সর্বত্র বাংলা প্রচলনের অধিকারও সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে বটে, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে—এবং কর্মক্ষেত্রেও—ইংরেজির দাপট ও প্রভাব বাড়ছে; বাংলাচর্চা সীমিত হয়ে পড়ছে। তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স, চার বছরের অনার্স কোর্স আমরা স্বেচ্ছায় চালু করেছি, এমনকি সেমিস্টার-ভিত্তিক কোর্স চালু হয়েছে—সম্ভবত উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার তাগিদ থেকে। ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ না হলেও জনমত তা নিষিদ্ধ করার পক্ষে এবং তারও চেয়ে বড় কথা, ছাত্ররাজনীতির নামে যা চালু আছে, তার দৃশ্যমান বড় অংশই নষ্টভ্রষ্ট এবং এর ভূমিকা সমাজে নেতিবাচক কিংবা সম্পূর্ণ অকার্যকর। ধ্বংসাত্মক ভূমিকা ছাড়া ছাত্রসংগঠনের পক্ষে আজ গঠনমূলক আন্দোলন করা আর সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। ইতিবাচক ছাত্র আন্দোলন যেমন গণজাগরণ মঞ্চ, সংগঠিত করছে সাধারণ ছাত্র-তরুণেরা।

আজকের দিনের বাস্তবতায় আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে যে বাংলাদেশের শিক্ষিত জনগণ দ্বিভাষী মানুষ হবে। মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিও শিখবে তারা। শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিরাট রূপান্তর দেখা যায় মাধ্যমিক পর্যায় থেকে বাণিজ্য শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের ঝোঁক বৃদ্ধিতে। ষাটের দশকে ছাত্রসংখ্যার দিক থেকে সর্বাগ্রে ছিল মানবিক শিক্ষার ধারা, তারপরে বিজ্ঞান এবং তার বহু পেছনে ছিল বাণিজ্য শিক্ষা। আজ বাণিজ্য শাখায় ছাত্র এতই বেড়েছে যে শহরে শহরে অনেক কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সব স্কুলে বাণিজ্য শাখার তুলনায় বিজ্ঞান ও মানবিকে ছাত্রসংখ্যা নগণ্য। এমনকি অনেক খ্যাতিমান স্কুলে মানবিক শাখা বন্ধ হয়ে গেছে।

এর প্রতিফলন ঘটছে উচ্চশিক্ষায়—অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কেবল বিবিএ-এমবিএ কিংবা প্রযুক্তিগত কোর্সের ওপরই চলছে। এভাবে উচ্চতর পর্যায়ে মৌলিক বিদ্যাচর্চা ব্যাহত হওয়ায় দেশে জ্ঞানচর্চার সংকট দেখা দিয়েছে, উচ্চতর গবেষণার সংখ্যা ও মানও কমেছে। হতাশার কথা, তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার সুযোগ ও আওতা অসীম পর্যায়ে যাওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষায় সম্ভাব্য প্রশ্নের ভিত্তিতে উত্তর মুখস্থ করার ধারা অব্যাহত। শিক্ষার প্রতি সর্বস্তরের মানুষের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে বাড়লেও সাধারণভাবে ছাত্রদের ভাষাগত দক্ষতা, মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা ও মননশীলতার মান কমে গেছে। সাহিত্যপাঠ, এমনকি সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক বা সমকালীন শিল্পসংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনার প্রতি তরুণদের আগ্রহ সামান্য। প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের প্রলোভন দিয়ে অনেক প্রয়াস চলছে বটে, কিন্তু তাতেও সাধারণভাবে পাঠাগ্রহ কমছে বৈ বাড়ছে না। একদিকে শিক্ষার হার ও ভর্তির সংখ্যা বাড়ছে আর অন্যদিকে পড়ার আগ্রহ ও পাঠকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে; এটা এক ধাঁধা।

স্কুল শিক্ষাকে একমুখী করা না হলে এবং মাতৃভাষা বাংলা ও গণিতের ওপর বিশেষ জোর ও যত্ন না নিলে শিক্ষার ভিত পোক্ত হবে না। ইংরেজি সবার জন্য বাধ্যতামূলক করলেও তা শেখায় উন্নতি ঘটাবে না, যেহেতু ৯০ শতাংশ পরিবারে ইংরেজি চর্চা চলে না। এমনিতেই বহু ধরনের আঞ্চলিক কথ্য উপভাষায় বিভক্ত সমাজের নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত পরিবারে প্রমিত বাংলা ভাষায় পঠনপাঠন শুরু করা ও তাতে সফল হওয়া দুরূহ কাজ।

জানি বিষয়টি এ সময়ে সম্ভবত কেউই মানতে চাইবেন না। তবু বলব, আদতে আমাদের পারিবারিক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক বাস্তবতা বিচার করলে শিক্ষার ন্যূনতম যে তিনটি বিষয় রয়েছে—বাংলা, ইংরেজি ও গণিত—তা মানসম্পন্নভাবে অর্জন সত্যিই সবার জন্য একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। প্রাথমিকে যদি একটি চ্যালেঞ্জ কমিয়ে বাংলা ও গণিতে সীমিত রাখা যায়, তাহলে অর্থ ও সময়ের অপচয় অনেকটাই রোধ করা যায়। শিক্ষার ভিত পোক্ত হলে দ্বিতীয় ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন হবে না, তখন সরকারের পক্ষেও এ খাতে ব্যয় বাড়ানো সম্ভব হবে। আর যেসব পরিবার গোড়া থেকেই ইংরেজি শেখাতে চায়, সামর্থ্য রাখে, তাদের জন্য সে সুযোগ রাখা যায়। এতে ষষ্ঠ শ্রেণিতে কেবল বাংলা পড়ে আসা ছাত্রদের জন্য ইংরেজির বাড়তি কোচিং ক্লাস রাখতে হবে। এটুকু যত্ন ঠিকঠাকভাবে নিলে দুই বছরের মধ্যেই তারা ইংরেজি জ্ঞানে অন্যদের সমকক্ষ হয়ে যাবে। বৈষম্য স্থায়ী হবে না।

ফলে দুটি কাজ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। স্কুল শিক্ষাকে একমুখী করা এবং ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে সঠিক কৌশল নির্ধারণ। শিক্ষা আন্দোলনের অর্ধশতক পরেও দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সঠিক পথে না চললে তা মানা যায় না। যেভাবেই হোক দেশের মূলধারার শিক্ষাকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে—শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে অর্থ ও সময়ের অপচয় চলতে দেওয়া উচিত নয়।

● আবুল মোমেন কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক।